পরম করুণাময় আল্লাহ নামে আরম্ভ করছি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন '৯৬ নির্বাচনী ইশতেহার

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জন্মলগ্ন থেকে বাংলার শোষিত-বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের দুঃখ-দুর্দশা বিমোচনের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। বাঙালি জাতির সকল সংগ্রাম ও আন্দোলনে আওয়ামী লীগ পালন করেছে অগ্রণী ভূমিকা। '৪৮ ও '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র নির্বাচন, '৫৮-র সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৪-তে দাঙ্গা বিরোধী আন্দোলন, '৬৬-তে স্বাধিকার আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন এবং সকল আন্দোলনের মিলন মোহনা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পালন করেছে এক অনন্য ও অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ভূমিকা। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গতিশীল ও সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলার মানুষের মুক্তি লক্ষ্যে এগিয়ে গেছে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে। বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ কখনো আপোষের পথে পা বাড়ায়নি বা কোন প্রকার ষড়যন্ত্র মোকাবেলায়ও পিছপা হয়নি। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং স্বাধীন জাতিসমূহের মাঝে বাঙালির আসন নিঃসন্দেহে বঙ্গবন্ধু এবং তার নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক অবদান।

সংগ্রামের এই ঐতিহ্যময় ধারাবাহিকতায় বিগত প্রায় দুই যুগ ধরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনতার পাশে থেকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই পরিচালনা করে যাচ্ছে। ১৯৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যে সরকার দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল, জাতির দুর্ভাগ্য, অচিরেই ঐ সরকার এক স্বৈরাচারী সরকারে পরিণত হয়। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে পতিত বিএনপি সরকার দুর্নীতি ও দুঃশাসনের বেড়াজালে আবদ্ধ করে সমগ্র দেশকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, দলীয়করণ, লুটপাট, হত্যা, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, রাহাজানি ইত্যাদি অপকর্মে দেশ ছেয়ে যায়। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার পদে পদে ভূলুণ্ঠিত হয়। এহেন দুঃসহ পরিস্থিতির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও দেশের সকল পেশা ও সর্বস্তরের মানুষ পুনরায় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য এক দীর্ঘ ও সুকঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন শাসকদল গণদাবির নিকট মাথা নত না করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণাকে উদ্ভট ও অযৌক্তিক আখ্যা দিয়ে তাদের ক্ষমতার মসনদকে পাকাপোক্ত করার অশুভ লক্ষ্যে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি এক ভোটারবিহীন প্রহসনের নির্বাচনের আয়োজন করে। ঐ নির্বাচন দেশ ও বিদেশীর কোথাও কারো কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি। ১২৪টি তাজা প্রাণের বিনিময়ে, বিরোধীদলীয় হাজার হাজার নেতা-কর্মীর কারাভোগ, নিযাতন ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা গণঅভ্যুত্থানে সূচিত হয় জনতার বিজয়। অথচ, যদি যথাসময় বিরোধীদলের ন্যায়সঙ্গত দাবি মেনে নেয়া হতো তাহলে নিরীহ অগণিত মানুষের জীবন ও সম্পদ ধ্বংস হতো না, দেশবাসীর দুর্ভোগ হতো না। বিএনপির ক্ষমতালিপ্সাই এসব জীবনহানি, সম্পদ ধ্বংস ও জনগণের দুর্ভোগের জন্য দায়ী। বাংলাদেশের বীর জনতার স্বতঃস্ফূর্ত ও অকুণ্ঠ সমর্থন এবং অংশগ্রহণের ফলেই এ গণঅভ্যুত্থানে পতন হয় অবৈধ ও স্বৈরাচারী বিএনপি সরকারের; প্রতিষ্ঠিত হয় নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। বিএনপি সরকারের তল্পিবাহক নির্বাচন কমিশন হয় পুনর্গঠিত। জনতার সমর্থনপুষ্ট এ সরকার অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের মাধ্যমে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে, দেশবাসীর এটাই প্রত্যাশা। জনগণ নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে নিজ পছন্দ অনুসারে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে তাদের কাঙ্ক্ষিত সরকার নির্বাচিত করতে পারলেই শহীদদের আত্মত্যাগ আর নির্যাতিতদের ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বিজয় সত্যিকারভাবে সার্থক ও সফল হবে।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সুখী সমৃদ্ধশালী ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর এ আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেশবাসীকে সাথে নিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে প্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে নবতর সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করবে।

বিগত পাঁচ বছরে বিএনপি সরকারের সীমাহীন দুর্নীতি, দলীয়করণ, অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও দুঃশাসনের ফলে দেশের অর্থনীতি, প্রশাসন ও আইন-শৃংখলা ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজ ও অবৈধ অস্ত্রধারীদের দৌরাত্ম্যে জনজীবন ও ব্যবসা-বাণিজ্য হয়ে উঠে দুঃসহ ও বিপর্যস্ত। বিনিয়োগকারীরা নিরুদ্যম ও হতাশ হয়ে পড়েন। বহু শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বদলে কৃষি উৎপাদন আজ নিম্নমুখী। বাংলাদেশের কৃষক সমাজের আজ বড়ই দুর্দিন। দেশের এ দুঃসময়ে বিএনপির মন্ত্রী, নেতারা দুর্নীতি ও সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। রাতারাতি তারা হয়েছে শত শত কোটি টাকার মালিক। দেশের অর্থনীতি, প্রশাসন ও আইন-শৃংখলা ব্যবস্থায় বিরাজমান বর্তমান বিপর্যয়কর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাস্তবমুখী ও কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণ করে তার বাস্তবায়নে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

একটি আধুনিক যুগোপযোগী এবং পরিকল্পিত উন্নয়ন কৌশলের ভিত্তিতে সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশবাসীর সামনে দলীয় কর্মসূচি উপস্থাপন করছে। একবিংশ শতাব্দি আজ আমাদের দ্বারপ্রান্তে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব আবিষ্কার ও প্রয়োগ বিশ্বকে দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের এ অগ্রযাত্রায় আমরাও শরীক হতে চাই, পিছিয়ে থাকতে চাই না। আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত একটি আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে চাই। আমরা চাই সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ। শান্তি, সমৃদ্ধি, উন্নয়ন, মানবিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বাংলার গণমানুষের রায়ের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের উপর সরকার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হলে ঘোষিত নীতিমালার ভিত্তিতে ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে ইনশাআল্লাহ্ আমরা এগিয়ে যাবো সুদৃঢ় পদক্ষেপে।

১। স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতার সরকার

ক) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় জীবনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করবে।

খ) রাষ্ট্র পরিচালনায় জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হবে। প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করে একটা দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ, উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুশৃঙ্খল প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তাবলী নিরূপণকল্পে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা হবে।

গ) প্রজাতন্ত্রের কর্মবৃত্তে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের জন্য সম্মানজনকভাবে জীবনধারণের উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এতদুদ্দেশ্যে বেতন কমিশন গঠন করা হবে।

ঘ) জাতীয় সংসদ হবে রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণ ও আইন প্রণয়নের প্রাণকেন্দ্র। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জাতীয় ঐকমত্যের উপর গুরুত্বারোপ করা হবে এবং তাতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

২। আইন শৃঙ্খলা

সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ চাই, নিরাপদ জীবন চাই- দেশবাসীর এ আকাঙ্ক্ষা আকুতির বাস্তব রূপ দিতে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করবে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে সর্বাত্মক প্রয়াস নেওয়া হবে। দলমত নির্বিশেষে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, রাহাজানিসহ সকল অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কঠোর হস্তে দমন করা হবে। মানুষের সম্পদ ও ব্যক্তিগত অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয় কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করা হবে। সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করে আওয়ামী লীগ নাগরিক জীবনে পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। এই লক্ষ্যে পুলিশ বাহিনীর উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের উপর গুরুত্বারোপ করা হবে। পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান নিশ্চিত করা হবে। আনসার, গ্রাম

প্রতিরক্ষা বাহিনী ও দমকল বাহিনীর সদস্যদের ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে এবং তাদের চাকরির মান ও মর্যাদা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩। দুর্নীতি উচ্ছেদ কার্যক্রম

দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গড়তে চাই- জনগণের এই প্রত্যাশা বাস্তবায়নে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। যারা দেশের সম্পদ লুট করছে, অবৈধ পথে সম্পদ গড়ছে, সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের সম্পদ আত্মসাৎ করছে বা করবে তাদের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের ভিত্তিতে দেশের প্রচলিত আইনানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। কৃষক ও কৃষি

ক) পাঁচ বছরে বিএনপি সরকার দেশের কৃষি-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। শুধুমাত্র ন্যায্যমূল্যে সারের দাবিতে পতিত সরকারের শাসনামলে ১৮ কৃষককে গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে। খাদ্যে বিদেশ-নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আওয়ামী লীগ এ ব্যবস্থার অবসান করবে। স্বল্প ও ন্যায্যমূল্যে সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ, সেচের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহ করে কৃষি উৎপাদনে কৃষকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। প্রয়োজনে এ খাতে যথোপযুক্ত ভর্তুকি দেওয়া হবে। প্রকৃত কৃষকের নিকট সহজ শর্তে কৃষি ঋণ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি চালু করাসহ প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কৃষিপণ্যের মূল্য কৃষকের জন্য লাভজনক এবং স্থিতিশীল রাখার কার্যকর নীতিমালা ও বাস্তবমুখী কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে। কৃষিপণ্য বাজারজাত করার জন্য আধুনিক ও প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হবে।

খ) ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ করা হবে। মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালন আধুনিকীকরণের কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ব্যাপকভিত্তিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হবে।

গ) ভূমি সংস্কার ও ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যুগোপযোগী ও আধুনিক কর্মসূচি প্রণয়ন এবং বাস্ত বায়ন করা হবে।

ঘ) ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণ এবং বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫। শিল্পায়ন ও বাণিজ্য

আওয়ামী লীগের শিল্পোন্নয়নের মূল লক্ষ্য হবে দেশজ শিল্পের বিকাশ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধি। আওয়ামী লীগ পোশাক ও বস্ত্রশিল্প, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া ও অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্প ও কৃষিভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে অগ্রাধিকার দিবে। তাঁত শিল্পের আধুনিকীকরণ এবং বিকাশের লক্ষ্যে তাঁতীদের নিকট ন্যায্য মূল্যে সূতা সরবরাহ, তাঁত ঋণ মওকুফ, ঋণদান ও উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা হবে। কামার, কুমার, জেলেসহ বিভিন্ন কর্মজীবীর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। মুক্তবাজার অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যক্তি উদ্যোগ, বিনিয়োগ ও ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প খাতকে সকল প্রকার সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা হবে। মুক্তবাজার অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যক্তি উদ্যোগ, বিনিয়োগ ও ব্যক্তিমালিকানাধীন শিল্প খাতকে সকল প্রকার সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা হবে। শিল্প ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও পদ্ধতিসমূহ সংস্কার করে সরলীকরণ করা হবে। শিল্পায়নের সুষম প্রসারের জন্য জেলা ও থানা পর্যায়ে শিল্প স্থাপনের সুযোগসৃষ্টি করা হবে। ক্ষুদ্র, মাঝারি, কুটির শিল্প ও শ্রমঘন শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে দেশের বেকার যুব সম্প্রদায়ের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে এবং প্রতিষ্ঠানকে প্রতিযোগিতামূলক লাভজনক সংস্থায় পরিণত করা হবে। অবাধ বাণিজ্যনীতির পাশাপাশি আমদানি ও রপ্তানির অসমতা দূর করে বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। দেশের অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন দ্রুততর করা হবে। ব্যক্তিমালিকানাধীন কোন আর্থিক, বাণিজ্যিক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে না।

৬। শ্রমনীতি

শ্রমের ন্যায্যমূল প্রদান করা আওয়ামী লীগের নীতি। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যারা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাদের কর্মের মূল্যায়ন ও জীবনের মানোন্নয়ন করার জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা গ্রহণ করা হবে। উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শ্রমিক শ্রেণীর একনিষ্ঠ অবদান ব্যতীত দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য পণ্যের গুণগত মান উন্নয়ন ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্য অর্জনে সৌহার্দ্যপূর্ণ শ্রমিক-মালিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য। এ উদ্দেশ্যে ত্রি-পক্ষীয় সমঝোতার ভিত্তিতে কার্যকর শ্রমনীতি প্রণয়ন করা হবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিজনিত সুফল শ্রমিকদের জন্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে মজুরির সম্পৃক্ততার সৃষ্টির প্রয়াস নেওয়া হবে। শিল্প বিরোধের দ্রুত নিষ্পত্তি এবং শিল্প-শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে যৌথ আলাপ-আলোচনায় আপোষ-মীমাংসা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনশনের বিধান মোতাবেক সকল শিল্প বিরোধ মীমাংসার পদ্ধতিসমূহের উন্নতি সাধন করা হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের আর্থিক পরিস্থিতি ও প্রচলিত শ্রম আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, চিত্তবিনোদন, কার্য পরিবেশ ইত্যাদি শ্রম কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। শিশুশ্রম রোধ কল্পে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭। সরকারি প্রচার মাধ্যম ও সংবাদপত্র

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। রেডিও, টেলিভিশন ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদ সংস্থাকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করার লক্ষ্যে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদান করা হবে। সরকারি মালিকানাধীন সংবাদপত্রসমূহকে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হবে।

৮। বিচার বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের মৌল নীতি অনুসারে বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে।

৯। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

আওয়ামী লীগ গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হবে। ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলাভিত্তিক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্যস্ত করা হবে। অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করে এ সকল স্থানীয় সরকারের আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করা হবে।

১০। শিক্ষা ও মানব সম্পদ

শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও মান উন্নয়নকে দেশের উন্নয়ন কর্মসূচির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে। দশ বছরের মধ্যে দেশকে যাতে নিরক্ষতার অভিশাপমুক্ত করা যায় সেজন্য সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করে এক জাতীয় আন্দোলন সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। প্রতি গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। প্রতি থানায় কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ধর্মীয় ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে উন্নতমানের ও আধুনিকীকরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ড. কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের আলোকে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে। যুগোপযোগী উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে এবং সকল প্রকার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সামগ্রিকভাবে উন্নত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সেশন জট নিরসনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শোষিত দারিদ্রক্লিষ্ট অবহেলিত বিশাল জনগোষ্ঠীকে মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন গড়ে তোলার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

১১। নারীর ও শিশুর সার্বিক উন্নয়ন

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর সমাজের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। নারী সমাজকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা হবে। নারীর নির্যাতন রোধ ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক

প্রসারকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী অবহেলিত নারী ও শিশুদের মর্যাদা, অধিকার ও ভাগ্যোন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

১২। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

সকলের জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। বঙ্গবন্ধুর সরকার প্রতি ইউনিয়নে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও প্রতি থানায় আধুনিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তার অসমাপ্ত কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা হবে। দুস্থ ও গরীব মানুষের কল্যাণে স্বল্পমূল্যে আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারণ করা হবে। দেশীয়

চিকিৎসা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পরিকল্পিত পরিবার গড়ে তোলার যাবতীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১৩। দারিদ্র্য বিমোচন ও সমাজ কল্যাণ

দরিদ্র ও বেকার জনগোষ্ঠীকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও আত্মনির্ভর জনশক্তিতে রূপান্তর করার সুষ্ঠু নীতিমালা গ্রহণ করা হবে। বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান করা হবে। বাংলাদেশে বিদ্যমান বাস্তবতায় উন্নয়ন কৌশলের লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য নিরসন, স্বাবলম্বিতা অর্জন ও মানব সম্পদের উন্নয়ন। এজন্য শ্রম, মেধা ও সম্পদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হবে। দারিদ্র্য নিরসনের কৌশল হবে বহুমুখী, বাস্তবানুগ ও সামগ্রিক উন্নয়ন ধারার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ছিন্নমূল নরনারী ও শহরের বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৪। ভৌত অবকাঠামো

কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ভৌত অবকাঠামো গড়ে তোলার উপর যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হবে। রেল ও রাজপথসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রতিটি ইউনিয়নকে থানার সঙ্গে এবং থানাকে জেলা সদরের সঙ্গে উন্নত সড়কের মাধ্যমে সংযুক্ত করা হবে। গ্রামীণ অর্থনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট, ব্রিজ ও সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ নেয়া হবে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে আধুনিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সুফল দেশের সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। প্রস্তাবিত পদ্মা, মেঘনা, রূপসাসহ সকল বৃহৎ নদীর ওপর সেতু নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। অভ্যন্তরীণ জলপথ ও নদীবন্দরসমূহের উন্নয়ন সাধন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হবে। চট্টগ্রাম ও চালনা সমুদ্র বন্দরের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পল্লী বিদ্যুতের ব্যাপক সম্প্রসারণসহ বিদ্যুতায়নকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হবে। স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

১৫। পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক সম্পদ

পানি সম্পদ, কৃষি ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মৌলিক উপাদান। পানি সম্পদ বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। নদ-নদী খনন, নদীর গতি নির্ধারণ, জলাধার নির্মাণ, ভাঙ্গন রোধ ও স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রাকৃতিক গ্যাস, সৌরশক্তি, আণবিক শক্তি ও পানি সম্পদ ব্যবহার করে আগামী ১০ বছরের মধ্যে সমগ্র দেশব্যাপী বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। তেল, গ্যাস, কয়লা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানে নিজস্ব উদ্যোগে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক প্রযুক্তি, সাহায্য এবং পুঁজি বিনিয়োগকে স্বাগত জানানো হবে। হাওর ও বাওড় অঞ্চল, ভাটি এলাকা ও সমুদ্র উপকূলবর্তী দ্বীপাঞ্চলের সমউন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা ও কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৬। পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও অনুন্নত সম্প্রদায়

ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি নাগরিকের সম-অধিকার ও সুযোগের পরিপন্থী সকল আইনের বিলোপ সাধন করা হবে। ন্যায়বিচার ও মৌলিক মানবাধিকার সমুন্নত করার লক্ষ্যে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয়

আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেশের অবহেলিত পশ্চাৎপদ উপজাতীয় অঞ্চলসমূহকে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সমপর্যায়ে উন্নত করার জন্য পরিকল্পনা নেয়া হবে। পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ যাতে দেশের অন্যান্য অঞ্চল ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের মতই সর্বক্ষেত্রে সমভাবে সমুদয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা হবে এবং তাদের সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ও ধর্মীয় আচার বিধি পালনের পূর্ণ নিশ্চয়তা দেওয়া হবে।

১৭। ভাষা ও সংস্কৃতি

সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষার উপরও গুরুত্বারোপ করা হবে। জাতির সাংস্কৃতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে শিল্প, সাহিত্য, নাট্যকলা ও অন্যান্য কলাশিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে। নাট্যশিল্প চর্চার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য বর্তমান অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল করে সময়োপযোগী ও সংস্কারমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

১৮। ক্রীড়া

ক্রীড়া ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, মনোযোগ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনার অভাবে ঈপ্সিত মাত্রায় অগ্রগতি হয়নি। আওয়ামী লীগ দেশের ক্রীড়া ক্ষেত্রে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং বর্তমান ক্রীড়া

অবকাঠামোর ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করবে। আন্তর্জাতিক মান অর্জনের লক্ষ্যে যুগোপযোগী ক্রীড়া নীতি প্রণয়ন করা হবে।

১৯। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও সীমান্তরক্ষা বাহিনীগুলোকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য যুগোপযোগীভাবে সুসজ্জিত করা হবে। সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয় ও জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করার লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিরক্ষা কলেজ স্থাপন করা হবে। অফিসার ও সৈনিকদের পেশাগত উন্নয়ন ও চাকরির নিরাপত্তা বিধানের জন্য ঔপনিবেশিক আমলে প্রণীত আইন পরিবর্তন করা হবে।

২০। পররাষ্ট্রনীতি

‘সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়’- বঙ্গবন্ধুর নির্ধারি এই মৌলিক নীতি অনুসরণ করেই আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে।

ক) বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা সুরক্ষিত রাখা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই হবে পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য। জাতিসংঘ ও জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা রাখার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন, কমনওয়েলথ, মুসলিম রাষ্ট্র সম্মেলন (ওআইসি) এবং সার্কের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, অর্থবহ ও

সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আওয়ামী লীগ সচেষ্ট থাকবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা ও সুসম্পর্কের ভিত্তিতে আঞ্চলিক সহযোগিতার কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার প্রয়াস গ্রহণ করা হবে। আওয়ামী লীগ সার্কের প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করবে এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সার্কের কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে।

খ) বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি নবায়ন করা হবে না। ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীনতা অর্জনকারী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এই চুক্তির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও সার্কভিত্তিক আঞ্চলিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে এই চুক্তি নবায়ন করার প্রয়োজন নেই। মিথ্যাচার ও বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে এই চুক্তি সম্বন্ধে বিভ্রান্তিমূলক প্রচারণা করা হয়েছে। বিগত বিশ বছরে কোন সরকারই এই চুক্তি বাতিল করার কথা মুখে উচ্চারণ করেননি। এমনকি এই চুক্তির কোন সমালোচনাও কখনো তারা করেননি। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর জনগণকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যেই বিএনপি এই চুক্তি সম্বন্ধে বিষোদগার ও উস্কানীমূলক প্রচারণা শুরু করেছে।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জিত হয়েছিল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃঢ় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলেই বাংলাদেশ পাকিস্তানি হানাদারদের দখলমুক্ত হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যেই ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহৃত হয়েছিল। বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহক হিসাবে আওয়ামী লীগ শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখবে।

গ) আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায্য দাবির ভিত্তিতে গঙ্গার পানি বণ্টনের প্রশ্নে বিএনপি সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ভারতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ৪৪ হাজার কিউসেক পানি পাওয়া নিশ্চিত করেছিলেন। জিয়াউর রহমান সাড়ে ৩৪ হাজার কিউসেকের ভিত্তিতে চুক্তি স্বাক্ষর করে মাত্র ২৭ হাজার কিউসেক পানি আনতে পেরেছিলেন। জেনারেল এরশাদ আনতে পেরেছিলেন ২০ হাজার কিউসেক। খালেদা জিয়ার সময় পানির হিস্যা কমে মাত্র ৯ হাজার কিউসেকে এসে দাঁড়ায়। এর ফলে এবং কোন চুক্তি না থাকায় সারা উত্তরবঙ্গ আজ দ্রুত মরু অঞ্চলে পরিণত হচ্ছে। ফারাক্কা সমস্যা সমাধানে বিএনপি সরকারের ব্যর্থতা বাংলাদেশের কৃষি ও অর্থনীতিকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ফারাক্কা সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে চুক্তি সম্পাদন করে সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধান করবে। অন্যান্য আন্তর্জাতিক নদীর পানি বণ্টনের প্রশ্নেও বাংলাদেশের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২১। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

সারাবিশ্বের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বর্তমান উন্নয়ন ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানব কল্যাণ ও উন্নতি বিধানে লাগসই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নব নব আবিস্কারসমূহের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে একবিংশ শতাব্দির উপযোগী একটি আধুনিক রাষ্ট্রের রূপান্তরিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া হবে। বিভিন্ন গবেষণা সংস্থাগুলোকে যুগোপযোগী ও উন্নতমানের করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

উপসংহার

সুদীর্ঘ প্রায় দুই যুগ ধরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে না থাকা সত্ত্বেও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপদানে নিরলস সংগ্রামী কর্মপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সমৃদ্ধ ও শোষণমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আওয়ামী লীগ অব্যাহতভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে আওয়ামী লীগ জনগণের নিকট প্রদত্ত ওয়াদা পালনের সংকল্পবদ্ধ থাকবে। ক্ষমতার বাইরে থেকে যেমন আমরা দেশবাসীর পাশে ছিলাম, রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলেও জনগণের পাশে থেকেই আমরা দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে যাব।

রাষ্ট্র পরিচালনা এক সুকঠিন দায়িত্ব। তদুপরি যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন দেশে শূন্য হাতে দেশ পুনর্গঠনের দায়িত্ব পালনে অতীতে আওয়ামী লীগের ভুলত্রুটি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অতীতের ভুল-ত্রুটি দেশবাসী

ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এ আমাদের প্রত্যাশা। জাতীয় ঐকমত্যই হবে সরকার পরিচালনায় আমাদের নীতি। নিপীড়নমূলক কর্মকাণ্ড নয়, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ ও মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই লক্ষ্য অর্জনে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে আপনাদের সমর্থন প্রার্থনা করছি। আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে দেশ সেবার সুযোগ দানের জন্য আকুল আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

সাধারণ নির্বাচনসমূহে আওয়ামী লীগের ফলাফল (১৯৫৪-১৯৯৬)

১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন ঢাকার টিকাটুলির রোজ গার্ডেনে আওয়ামী লীগের (তখন সংগঠনের পরিচিতি ছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ) প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই তা বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর পেছনে প্রধান কারণ ছিল মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মরহুম মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসাধারণ সাংগঠনিক প্রতিভা এবং জনগণকে আকর্ষণ করার ক্যারিশমা। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি, ভাসানী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং বঙ্গবন্ধু ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক। স্মর্তব্য বঙ্গবন্ধু কারাগারে অন্তরীণ থাকা অবস্থায় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক পদে আসীন হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক মরহুম শামসুল হক ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালে ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে মানসিক ভারসাম্যহীন ও ব্যাধিগ্রস্ত মরহুম শামসুল হকের স্থলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। সেই থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৩ বছর তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। প্রধানত বঙ্গবন্ধুর যাদুকরী নেতৃত্ব এবং মোহনীয় ব্যক্তিত্বের কারণে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই নজিরবিহীন জনসমর্থনপুষ্ট সংগঠনের মর্যাদা লাভ করেন।

ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে নির্বাচন লড়ার জন্য ১৯৫৩ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান নেজামে ইসলাম পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ও পাকিস্তান খেলাফতে পার্টির সহযোগিতায় যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। ঐতিহাসিক ২১ দফার ভিত্তিতে

যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই ২১ দফা ছিল আওয়ামী লীগের ৪২ দফা ইশতেহারেরই সংক্ষিপ্ত রূপ। নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা।

১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্বতন্ত্র নির্বাচনী প্রথায় অনুষ্ঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন। বাকি ৫টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হন। ৭২টি সাধারণ নির্বাচনী কেন্দ্র অর্থাৎ অমুসলিম আসনের মধ্যে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ২৫টি, সিডিউল কাস্ট ফেডারেশন ২৭টি, যুক্তফ্রন্ট (সংখ্যালঘু) ১৩টি, কমিউনিস্ট পার্টি ৪টি এবং গণতন্ত্রী দল ৩টি আসনে জয়লাভ করে। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী মুসলিম লীগ ১৪৩টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হয়।

পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের নির্বাচনসমূহ ছিল সার্বিক অর্থেই প্রহসনের নির্বাচন। পাকিস্তানের জন্মের ২২ বছর পর ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর দেশে প্রথমবারের মতো প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষভাবে গণপ্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬ দফার ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ সে নির্বাচনকে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ৬ দফার উপর রেফারেন্ডাম বা গণভোট হিসেবে ঘোষণা করে। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ১৬২ আসনের মধ্যে ১৬০টিতেই আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়লাভ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ছিল মাত্র ৭ জন। তারা কেউই অবশ্য নির্বাচিত হতে পারেননি। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সংরক্ষিত ৭টি মহিলা আসনের মধ্যে সব কটিই আওয়ামী লীগ লাভ করে। ফলে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ১৬৭। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮ আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ৭৩ শতাংশ এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে প্রায় ৭৭ শতাংশ ভোট লাভ করে সংসদীয় রাজনীতির ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের মানুষ জাতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ এবং ৬ দফার ভিত্তিতে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আওয়ামী লীগের এই অভূতপূর্ব নির্বাচনী বিজয়ের পেছনে প্রাণপুরুষ ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ। মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে ১০টি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়। মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯৩টি আসন লাভ করে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ও বাংলাদেশ জাতীয় লীগ একটি করে আসন পায়। ৫টি আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিজয়ী হন। সর্বমোট ১৪টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১০৯১ জন। মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩,৫২,০৫,৬৫২ জন। প্রদত্ত ভোটের হার ছিল শতকরা ৫৫.৬২। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাৎ বরণের কারণে এবং সামরিক শাসন জারি হওয়ায় প্রথম জাতীয় সংসদ মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই ১৯৭৫ সালের ৬ই নভেম্বর বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রথম জাতীয় সংসদে

সংসদ নেতা ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জাতীয় দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করায় মরহুম মোহাম্মদ মনসুর আলী সংসদ নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন।

রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার অধীনে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি। সর্বমোট ২৯টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের উপর হত্যা ও নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো সত্ত্বেও দল দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে ৩৯টি আসন লাভ করে। স্মরণ করা যেতে পারে বঙ্গবন্ধু এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চার জাতীয় নেতার মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগ তখনও সংগঠিত হতে পারেনি। তাছাড়া এই নির্বাচন ছিল সামরিক ডিকটাট (Diktat)

এবং কারচুপির নির্বাচন। ক্ষমতাসীন সামরিক প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় থেকে তার গঠিত রাজনৈতিক দল বিএনপিকে জেতানোর জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যবহার করেছিলেন। তা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের ফলাফল ছিল আশাপ্রদ। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য জনাব আসাদুজ্জামান খান। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদও তার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ সামরিক শাসন জারির প্রেক্ষিতে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনের অধীনে ১৯৮৬ সালের ৭ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত হয় তৃতীয় সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনেও জেনারেল জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এরশাদ তার জাতীয় পার্টিকে ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিনিয়ে নেয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করেছিল বঙ্গবন্ধু কন্যা ও তার রাজনীতির উত্তরাধিকার জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে। আওয়ামী লীগের ৮ দলীয় জোট শতাধিক আসনে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগের একক আসন সংখ্যা ছিল ৭৬। বিরোধীদলীয় নেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন শেখ হাসিনা। তৃতীয় জাতীয় সংসদও মেয়াদ পূর্তির আগেই ১৯৮৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর বিলুপ্ত হয়ে যায়।

চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ। আওয়ামী লীগ এই নির্বাচন বর্জন করে।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার মিত্রদের সহযোগিতায় শতাধিক আসনে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগের একক আসন সংখ্যা ছিল ৯২। পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচনে শতকরা প্রায় ৩৮ ভোট পাওয়া সত্ত্বেও জননেত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় সূক্ষ্ম কারচুপির কারণে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিনতাই হয়ে যায়। শতকরা প্রায় ৩১ ভাগ ভোট পেয়ে বিএনপি জামায়াতে ইসলামের

সমর্থনে সরকার গঠন করে। পঞ্চম জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা।

ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি। আওয়ামী লীগসহ সবকটি প্রধান বিরোধী দল এ নির্বাচন বর্জন করে। একদলীয় এই নির্বাচন ছিল প্রহসন ও ভোট ডাকাতির নির্বাচন। এই সংসদ জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রবল গণঅভ্যুত্থানের কারণে ৩০শে মার্চ অর্থাৎ গঠিত হওয়ার মাত্র ১২ দিনের মাথায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। জননেত্রী শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গণতন্ত্রের বিজয় হয় সূচিত। প্রতিষ্ঠিত হয় 'আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব' এই অধিকার তথা ভোটের অধিকার যা ছিল জননেত্রী শেখ হাসিনা তথা আওয়ামী লীগের ২১ বছরের লাগাতার সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি।

বিচারপতি হাবিবুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তি পূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত ১২ই জুন ১৯৯৬-এর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এককভাবে প্রায় ৩৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ৩০০টি আসনের মধ্যে ১৪৬টি আসনে জয়লাভ করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ৩০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮টি আসন লাভ করে। সপ্তম সংসদে আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও জাতীয় পার্টি এবং জাসদ সমন্বয়ে আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঐকমত্যের সরকার প্রতিষ্ঠিত করে।

অতএব, দেখা যাচ্ছে আওয়ামী লীগ কখনোই নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত কোন নির্বাচনেই পরাজিত হয়নি। গণঅভ্যুত্থানেও আওয়ামী লীগ অতীতে কখনো ক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়নি। আওয়ামী লীগকে অতীতে অসাংবিধানিক ও অন্যায়ভাবে হত্যা ও ক্যু-এর মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ একটি নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে ব্যালটে, বুলেটে নয়। আওয়ামী লীগের সব সময়েই আস্থা জনরায়ের ওপর। এ জন্যই আওয়ামী লীগ সবসময়েই নিরপেক্ষ-নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সোচ্চার ছিল এবং তা কায়েমও করে। এর কারণ

আওয়ামী লীগের সাথে জনগণের রয়েছে তৃণমূল পর্যায়ে অবিচ্ছেদ্য নাড়ীর বন্ধন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ দুবার নির্বাচনে বিপুল বিজয় লাভ করে। এর আগে সোহরাওয়ার্দী-ভাসানী-বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে আতাউর রহমান খানকে মুখ্যমন্ত্রী করে দুবার সরকার গঠন করেছিল। বঙ্গবন্ধুর শাহাদাৎ বরণের পরে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনে জয়লাভ করে দীর্ঘ ২১ বছর পর আওয়ামী লীগ আবারো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে।

আওয়ামী লীগের অর্ধশতাব্দির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ (১৯৪৯-৯৯)

ঐতিহ্যবাহী গণসংগঠন আওয়ামী লীগের জন্ম হয়েছিল ঢাকার টিকাটুলির কে. এম. দাস লেনস্থ রোজ গার্ডেনে জনাব কে. এম. বশিরের বাসভবনে ১৯৪৯ সালের ২৩শে জুন। এ উপলক্ষে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়েছিল মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি ও ইয়ার মুহাম্মদ খানকে সম্পাদক করে। এটা ছিল মাওলানা আকরাম খানের নেতৃত্বাধীন পকেট মুসলিম লীগের পাল্টা কর্মী সম্মেলন। এতে ৩ শতাধিক ডেলিগেট অংশগ্রহণ করেন। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান মাওলানা ভাসানীর লিখিত উদ্বোধনী ভাষণের পর জনাব আতাউর রহমান খান সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকও সম্মেলনে কিছুক্ষণের জন্য যোগ দিয়েছিলেন এবং তাতে বক্তব্য রাখেন। সাধারণ ধারণা ছিল তিনি আওয়ামী লীগে যোগদান করবেন। কিন্তু তা না করে পরবর্তীতে তার নিজ দল কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠন করেছিলেন।

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নবগঠিত পার্টির নাম আওয়ামী মুসলিম লীগ অর্থাৎ জনগণের মুসলিম লীগ নামকরণের প্রস্তাব করেছিলেন বেশ আগেই। সে অনুযায়ী দলের নামকরণ হয়েছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। শহীদ সোহরাওয়ার্দী আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের ব্যাপাওে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। যে কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা সফল করার জন্য তিনি জনাব শওকত আলীকে উৎসাহিত করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের ৪০ সদস্যবিশিষ্ট সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। স্মতর্ব, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন কারাগারে ছিলেন। একটি কার্যকরী বিরোধী দল গঠনের ব্যাপাওে অনেক আগে থেকেই তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। আওয়ামী লীগের প্রথম সাংগঠনিক কমিটির নেতৃবৃন্দেও মধ্যে ছিলেনঃ

সভাপতি	- মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
সহ-সভাপতি	- আতাউর রহমান খান, এডভোকেট
সহ-সভাপতি	- সাখাওয়াত হোসেন, প্রেসিডেন্ট, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স
সহ-সভাপতি	- আলী আহমদ খান, এমএলএ
সহ-সভাপতি	- আলী আমজাদ খান, এডভোকেট
সহ-সভাপতি	- আবদুস সালাম খান, এডভোকেট
সাধারণ সম্পাদক	- শামসুল হক
যুগ্ম-সম্পাদক	- শেখ মুজিবুর রহমান
কোষাধ্যক্ষ	- ইয়ার মোহাম্মদ খান।

জনাব সোহরাওয়ার্দী নিখিল পাকিস্তানভিত্তিক আওয়ামী মুসলিম লীগ সংগঠিত করেন ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে। ১৯৫৩ সালে লাহোরে এক কর্মী সম্মেলনে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন জনাব সোহরাওয়ার্দী এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী। এই কর্মী সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের একটি প্রতিনিধি দল যোগদান করে। প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন মাওলানা ভাসানী এবং তরুণ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৫২ সালের দিকে কারাবন্দী অবস্থায় জনাব শামসুল হক অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে মানসিক ভারসাম্য হারান। ১৯৫২ সালের ২৭শে এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে দলের অফিসিয়েটিং সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৫৩ সালের ৯ই জুলাই আওয়ামী লীগের প্রথম প্লেনারী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার মুকুল (আজাদ) প্রেক্ষাগৃহে। এই অধিবেশনে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পূর্ণাঙ্গ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত কওে আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি গঠিত হয়। ১৯৫৫ সালের ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বসে। এই অধিবেশনে আওয়ামী লীগ থেকে মুসলিম শব্দ বর্জন করে আওয়ামী লীগকে ধর্মনিরপেক্ষ দলের চরিত্র প্রদান করা হয় যা ছিল তখনকার প্রেক্ষাপটে একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এই কাউন্সিলেও মাওলানা ভাসানী দলের সভাপতি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়। ১৯৫৭ সালের ১৩ ও ১৪ জুন ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে একই বছরের ৭ ও ৮ই ফেব্রুয়ারি কাগমারীতে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ঢাকার কাউন্সিল অধিবেশনে আবারও মাওলানা ভাসানী শেষবারে মতো দলের সভাপতি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

১৯৫৭ সালের ২৪শে জুলাই মাওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগের সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করলে মাওলানা তর্কবাগীশ আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। বঙ্গবন্ধু যথারীতি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে কাজ চালিয়ে যান।

১৯৬৪ সালের ২৫শে জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বীয় বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সম্পাদকবৃন্দ এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ সদস্যদের এক যুক্ত সভা আহ্বান করে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করেন। মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ পুনরুজ্জীবিত আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং বঙ্গবন্ধু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এদিকে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগও পুনরুজ্জীবিত হয়। নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং জনাব জহিরুদ্দিন ও পরে জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৫৭ সালে জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে মাওলানা ভাসানীর সাথে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে (ন্যাপ) যোগদান করেছিলেন।

১৯৬৬ সালের ১লা মার্চ অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনাব তাজউদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত ঐতিহাসিক ৬ দফা দলের অনুমোদন লাভ করেছিলো। ১৯৬৭ সালে বঙ্গবন্ধুসহ নেতৃবৃন্দ কারাগারে থাকার সময়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম দলের অস্থায়ী সভাপতি এবং আমেনা বেগম অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আমেনা বেগম পরবর্তীকালে জনাব আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগে যোগদান করেন। ১৯৬৯ সালের ১লা আগস্ট অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে আবারও বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এদিকে বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সভাপতি ও কামরুজ্জামান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন আগেই।

১৯৭২ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় সভাপতি পদে এবং জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে সভাপতি ও জনাব জিল্লুর রহমান দ্বিতীয়বারের মতো সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন।

১৯৭৫ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি জাতীয় দল বাকশাল গঠন করা হলে বঙ্গবন্ধু দলের চেয়ারম্যান এবং জনাব মনসুর আলী মহাসচিব নিযুক্ত হন। তিনজন সম্পাদক ছিলেন- জনাব জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মনি ও

জনাব আবদুর রাজ্জাক। ১৯৭৬ সালে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন, সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, জনাব আব্দুর রাজ্জাক, জনাব আমির হোসেন আমু, জনাব আব্দুল মালেক উকিল এবং ডঃ কামাল হোসেন প্রমুখ আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠিত করেন। সে বছর অনুষ্ঠিত দলের দশম বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনে সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিনকে পুনর্গঠিত আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক নির্বাচিত করা হয়। ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত ১১তম কাউন্সিল অধিবেশনে জনাব আব্দুল মালেক উকিল আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের দ্বাদশ কাউন্সিল অধিবেশন। এই কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সভানেত্রী এবং জনাব আবদুর রাজ্জাককে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ১৯৮৬ সালে ১লা অক্টোবর আওয়ামী লীগের ত্রয়োদশ কাউন্সিলে শেখ হাসিনা পুনরায় সভানেত্রী এবং সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯২ সালের ১৯ ও ২০শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের ১৪তম কাউন্সিল অধিবেশন। জননেত্রী শেখ হাসিনা পুনরায় সভানেত্রী এবং জনাব জিল্লুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগ বাজার অর্থনীতির নীতিসহ বিভিন্ন যুগোপযোগী নীতিমালা গ্রহণ করে। জননেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগে নতুন চিন্তা ও চেতনার সঞ্চার করেন। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। একটি

উপদেষ্টামণ্ডলীর বিধান রাখা হয়। আওয়ামী লীগের পঞ্চদশ তথা সর্বশেষ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৭ সালের মে মাসে যখন আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর জনগণের রায় নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এই কাউন্সিলে জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং জনাব জিল্লুর রহমান পুনরায় যথাক্রমে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সূত্র ঃ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ ১৯৪৯-৯৯।